গুরুসদয় দত্ত নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ

সংকলন ও সম্পাদনা
বারিদবরণ ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

বাঙালির সংস্কৃতি জাগরণের ক্ষেত্রে গুরুসদয় দত্ত একটি স্মরণীয় নাম, কিন্তু তিনি ক্রমবিস্মরণের পথে। এজন্যে কে দায়ী বা এর কারণ কি কি তা বুঝতে আমাদের বেশি কাঠখড় পোড়ানোর দরকার নেই। আমাদের জাতীয় চরিত্র এবং পরিবর্তিত সমাজবোধ— এমন একটি সার্বিক বাঙালিকে আমাদের ক্ষেত্র থেকে ক্রমশ অপসারিত করে চলছে। এটা আক্ষেপের সন্দেহ নেই, কিন্তু নিরুপায়ও। সেজন্যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তাঁর আচরণ এবং শিক্ষাকে আমাদের আরও একবার স্মরণ করার। তাঁর রচনাবলি সুপ্রাপ্য নয়। কয়েকটি বই অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলেও অধিকাংশ বই পাওয়া যায় না। আমরা এই রচনাসংগ্রহে তাঁর মুখ্য রচনাবলি সংগ্রহ করার প্রয়াস পেয়েছি। আরও সংগৃহীত হলে ভাল হত। কিন্তু জীর্ণ পত্রিকাদির দুষ্প্রাপ্যতা ও ভঙ্গুরতা আমাদের অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। তাছাড়া নির্বাচিত সংকলনের একটা সীমাবদ্ধতাও থেকেই যায়। তাঁর সংকলিত রচনাদি আমাদের পরিহার করতে হয়েছে সেগুলি তাঁর মৌলিক রচনা নয় বলে। সেকারণেই পটুয়াসংগীত বা শ্রীহট্টের লোকসংগীত এখানে সংকলিত হয়নি। পটুয়াসংগীত-এর একটি পৃথক সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশের আয়োজন অবশ্য গৃহীত হয়েছে। তাঁর সাধ্বীপত্নীর জীবনী 'সরোজনলিনী'ও গৃহীত হয়নি এটি অন্যত্র মুদ্রিত হচ্ছে বলে। এছাড়া তাঁর মুখ্যরচনাবলি অশেষ পরিশ্রমে সংগৃহীত হয়েছে। ফলে তাঁকে তাঁর রচনার মাধ্যমে জানবার একটা অবকাশ রচিত হয়েছে।

২

গুরুসদয় দত্তকে যাঁরা কিছু কিছু জানেন, তাতে তাঁর পটপ্রীতি বা ব্রতচারী অন্দোলন-বিষয়ে তাঁরা অবগত আছেন। কিন্তু সেটিই তাঁর সর্বস্ব পরিচয় নয়। তিনি আরও প্রসারিত এবং মূল্যবান। বস্তুতপক্ষে আক্ষেপ জাগে তাঁর একটি প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থান থাকলেও কেন তাঁকে বৃহত্তর পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার আয়োজন হয়নি— একথা ভেবে। বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার ধীরশ্রী গ্রামে এই বীরসন্তানের শ্রীময় জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১০মে তারিখে। মোটামুটি সচ্ছল এবং ততোধিক মাননীয় রামকৃষ্ণ দত্তের ছয় পুত্রকন্যার মধ্যে গুরুসদয় ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, তাঁদের পদবি ছিল দত্তচৌধুরি, বাবা রামকৃষ্ণ পর্যন্ত এই পদবিই চলে এসেছে, কেন জানিনা গুরুসদয় 'চৌধুরী' ত্যাগ করে কেবল 'দত্ত' পদবিই ব্যবহার করে এসেছেন। এই পরিবারের সচ্ছলতা এসেছিল জমি থেকে এবং উল্লেখ করার বিষয় জমিদার হয়েও তাঁর জ্যেষ্ঠতাত রাধাকৃষ্ণ নিজের খামার বাড়িতে 'নিজের হাতে লাঙল চালাতেন' এবং তাঁদের 'সুবিস্তৃত ফুল ও ফলের বাগানে' তাঁর 'বাবা নিজে কোদাল ও খুরপি নিয়ে প্রত্যহ

খাটতেন'। অতএব খনার বচন সার্থক হয়েছিল— 'খাটে খাটায় দ্বিগুণ পায়'— অবস্থাপন্ন হওয়া, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবার এর চেয়ে সহজ উপায় আর কী হতে পারে?

শুধু চাষ-আবাদ নয় সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার দিকেও এই পরিবারের নজর ছিল। দুরন্ত গুরুসদয়ের শিক্ষাজীবন তাই বাস্তবিকই ফলপ্রদ হয়েছিল। কুশিয়ারা নদীতে কলার ভেলা চড়ে ঠিক ইন্দ্রনাথের (শ্রীকান্ত) মতোই দুঃসাহসে তিনি এপার-ওপার করতেন। গাছে চড়া, সাঁতার কাটা আর ঘোড়ায় চড়া (আই সি এস পরীক্ষায় অশ্বারোহণে ১০০-এর মধ্যে ১০০ নম্বর!) তার ছোটবেলার নিত্য ব্যায়াম ছিল। জ্যাঠামশায় রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরি গ্রামে মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠ করেছিলেন— সেখানের শিক্ষক তারকচন্দ্র রায়ের (তিনিই ঐ গ্রামে প্রথম ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলার প্রচলন করেন) তত্ত্বাধানে গুরুসদয়ের জীবন সংগঠিত হয়েছিল। তিনিই বলেছিলেন— জীবনে তাস খেলায় বসবি না, সে কথা ছাত্রটি সুবোধ বালকের মতো মেনে চলেছিলেন। তিনিই ছাত্রকে কোঁচা দুলিয়ে কাপড় না পরে মালকোঁচা মেরে কাপড় পরতে বলেছিলেন— সেকথাও সারাজীবন মান্য করেছিলেন। মায়ের কাছে রামায়ণ শিখে যে বালকের শিক্ষাজীবনের সূত্রপাত গ্রামের মাইনর স্কুলের পাঠ সেরে সেই বালক শ্রীহট্ট ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়ে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধীকার করে উত্তীর্ণ হন ১৮৯৯ সালে। এবং মেধা অনুসারে অসমের মধ্যে প্রথম। ১৯০১ সালের ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এবং সিন্ধিয়া স্বর্ণপদক লাভ।

এরপরে বিলেতযাত্রা (১৯০৩) পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকটির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব নিয়েছিলেন শ্রীহট্ট সম্মিলনী তাঁর ১৬ বছর বয়স থেকে। তারাই এখন তাঁর বিদেশবাসের যাবতীয় ব্যয়ের দায়িত্ব নিলেন। ১৯০৪ সালের আই সি এস পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন সপ্তম স্থান অধিকার করে এবং কেম্ব্রিজের ইমানুয়েল কলেজে প্রবেশনারি কালে কনস্টিটিউশনাল ল' আইন পরীক্ষায় হলেন প্রথম! ছাত্র হিসেবে গর্ব করার বইকি!

দু'বছর পর তিনি যখন গয়া জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে কর্মরত তখন সেখানকার এস ডি ও আর এক আই সি এস ব্রজেন্দ্রনাথ দে-র (বি. দে. নামেই পরিচিত) চতুর্থ কন্যা সরোজনলিনীকে বিয়ে করেন। তাঁদের বিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে সরোজনলিনীর ভূমিকা ছিল অতুলনীয়। এমন আদর্শ দাম্পত্যজীবন ইহসংসারে বাস্তবিকই দুর্লভ। রবীন্দ্রনাথ এই দম্পতিকে 'আশীর্বাদ' করে লিখেছিলেন— 'হৃদয় বাঁধনে অসীম মুক্তি/ত্যাগের সাধনে পূর্ণ প্রেম,/এই তো জীবনে পরম প্রাণ/এই তো ভুবনে মরম ক্ষেম।/সে প্রেমে তোমরা হয়েছ ধন্য/কল্যাণ-ব্রজে হয়েছ ব্রতী,/যুগল-মিলনে জ্বলিল যে-দীপ/অক্ষয় হোক তাহার জ্যোতি।' (বঙ্গলক্ষ্মী, পৌষ ১৩৪০, পৃ. ৭৫)। ১৯০৯ সালে জন্ম হয় তাঁদের একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্র সদয়ের।

গুরুসদয়ের কর্মজীবন নানা স্থানে অতিবাহিত হয়। তিনি বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৯৩১-৩৩ সালে এখানে আগেও ছিলেন। তার আগে হাওড়া (১৯২৮) এবং ময়মনসিংহে (১৯২৯) একই পদে আসীন ছিলেন। বীরভূমের কর্মজীবনই তাঁকে ব্রতচারী আন্দোলনে দীক্ষিত করে তুলেছিল। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যও হয়েছিলেন

(১৯৩৩)। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করন। এবছরেই তিনি জামসেদপুরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন। ১৯২৫ সালে তিনি বিপত্নীক হয়েছিলেন আর অবসরগ্রহণের কিছুদিনের মধ্যেই ২৫ জুন ১৯৪১ তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

গুরুসদয় তাঁর কর্মজীবনে একধিকবার বিদেশভ্রমণ করেন। ১৯১৯ সালে তিনি বীরভূমের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তখন দুবছরের ছুটি নিয়ে স্ত্রীপুত্রসহ জাপানভ্রমণে যান। এখানে তাঁরা দু-তিন মাস ছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি আমাদের দেশে কাজে লাগাবার আয়োজন করেছিলেন। এখানে বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেসব বক্তৃতা সেখানের সমঝদার মানুষের বাহবা কুড়িয়েছিল।

জাপান থেকে রওনা হয়েছিলেন সিংহল হয়ে ব্রিটেনে। সেখানে পুত্র বীরেন্দ্রসদয়কে একটি বোর্ডিং স্কুলে ভর্তি করে দেন। এরপর নানান জায়গায় বেড়ানোর পর তাঁরা ফ্রান্সে বেড়াতে যান— ফিরে আসেন ১৯২৩ সালে।

এর দুবছর পরে ১৯২৫ সালের ১৯ জানুয়ারি সরোজনলিনীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠানে রূপ দিয়ে স্থাপিত হল সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি মৃত্যুর মাসখানেকের মধ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে। মহিলাদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য প্রকাশিত হল মাসিক 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকা। দিল্লি, কোচিন, লন্ডনে স্থাপিত হল সমিতির শাখা সমূহ। ব্রিটেন, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়ার নাম নারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমিতির যোগ স্থাপিত হয়।

গুরুসদয় নিজে লিখলেন সরোজনলিনীর জীবনী। এর প্রথম সংস্করণ প্রচারিত হয়, ১৯২৬ সালের জানুয়ারিতে পত্নীর মৃত্যুর প্রথম বার্ষিকীতে। পর পর তিন বছরে তিনটি সংস্করণ মুদ্রিত হয়। বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ সমিতির ভাণ্ডারে প্রদত্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ বইটির জন্য একটি অনবদ্য ভূমিকা লিখেছেন। প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দত্ত-দম্পতির ঘনিষ্ঠতা ছিল। এই বইটিতেই গুরুসদয় তার একটি প্রসঙ্গ লিখে গেছেন ঃ

> এতদিন আমরা সন্ধ্যারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করিতে যাই। সরোজনলিনী কখনও রবীন্দ্রনাথকে গান গাহিতে শুনেন নাই। আমি ছাত্রাবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে অতি চমৎকার গাহিতে শুনিয়াছি তাহা আমার নিকট হইতে জানিয়া রবীন্দ্রনাথের গান শুনিবার জন্য তিনি ব্যগ্র ছিলেন ও সেইদিন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে নানা প্রকার ওজর আপত্তি করিলেন, কিন্তু সরোজনলিনীর অনুরোধ এড়াইতে পারিলেন না। দু'তিনটা গান গাহিলেন।.... কোন যন্ত্র ছিল না, রবীন্দ্রনাথ হাততালি দিয়া তাল রাখিয়া গাহিলেন, তার মধ্যে একটি গান ছিল ঃ
>
> "আয় রে পাগল
> ভুলবি রে তোর আপনাকে"।

এবার আমরা রবীন্দ্র-রচিত ভূমিকাটি উদ্ধার করি ঃ

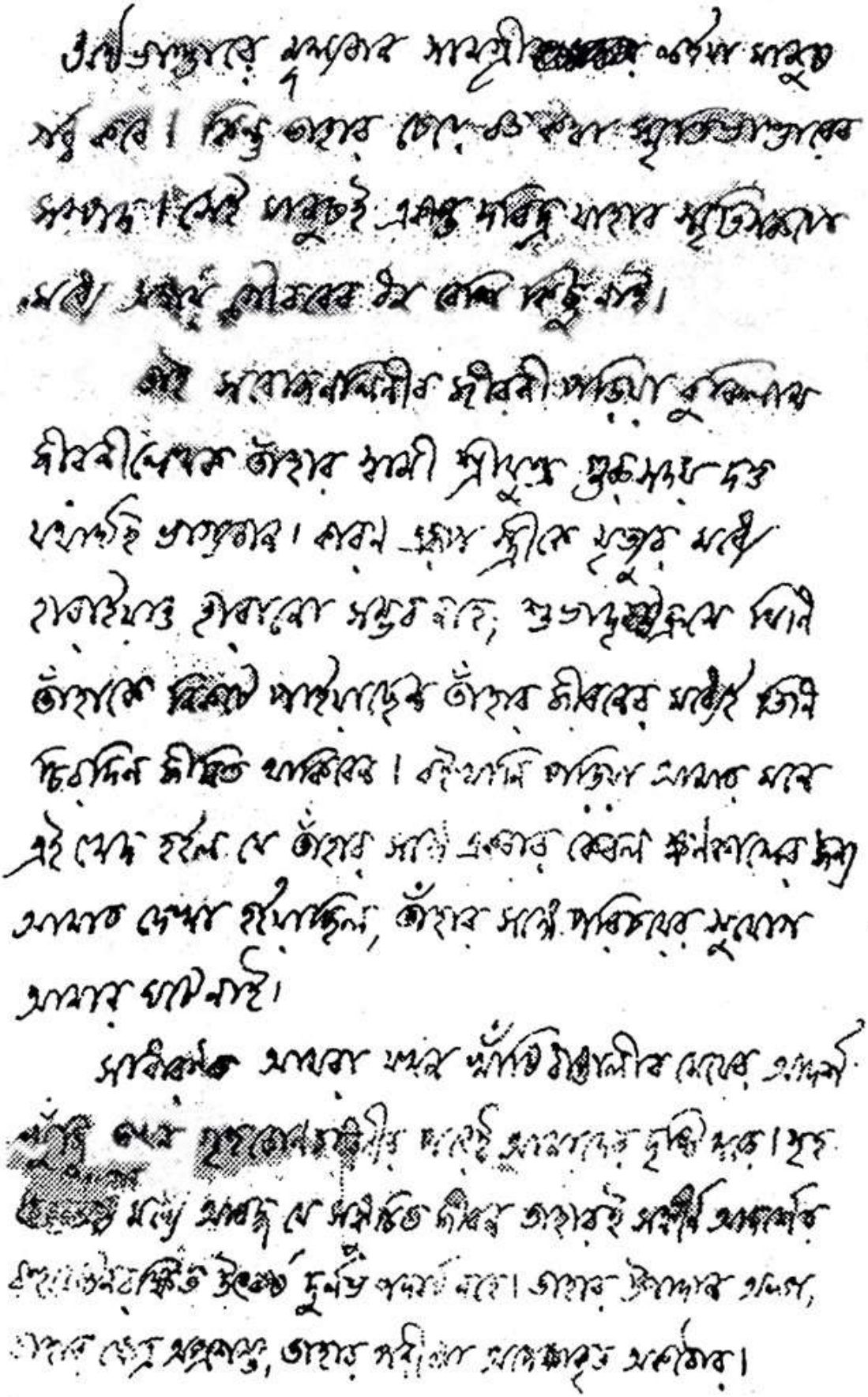

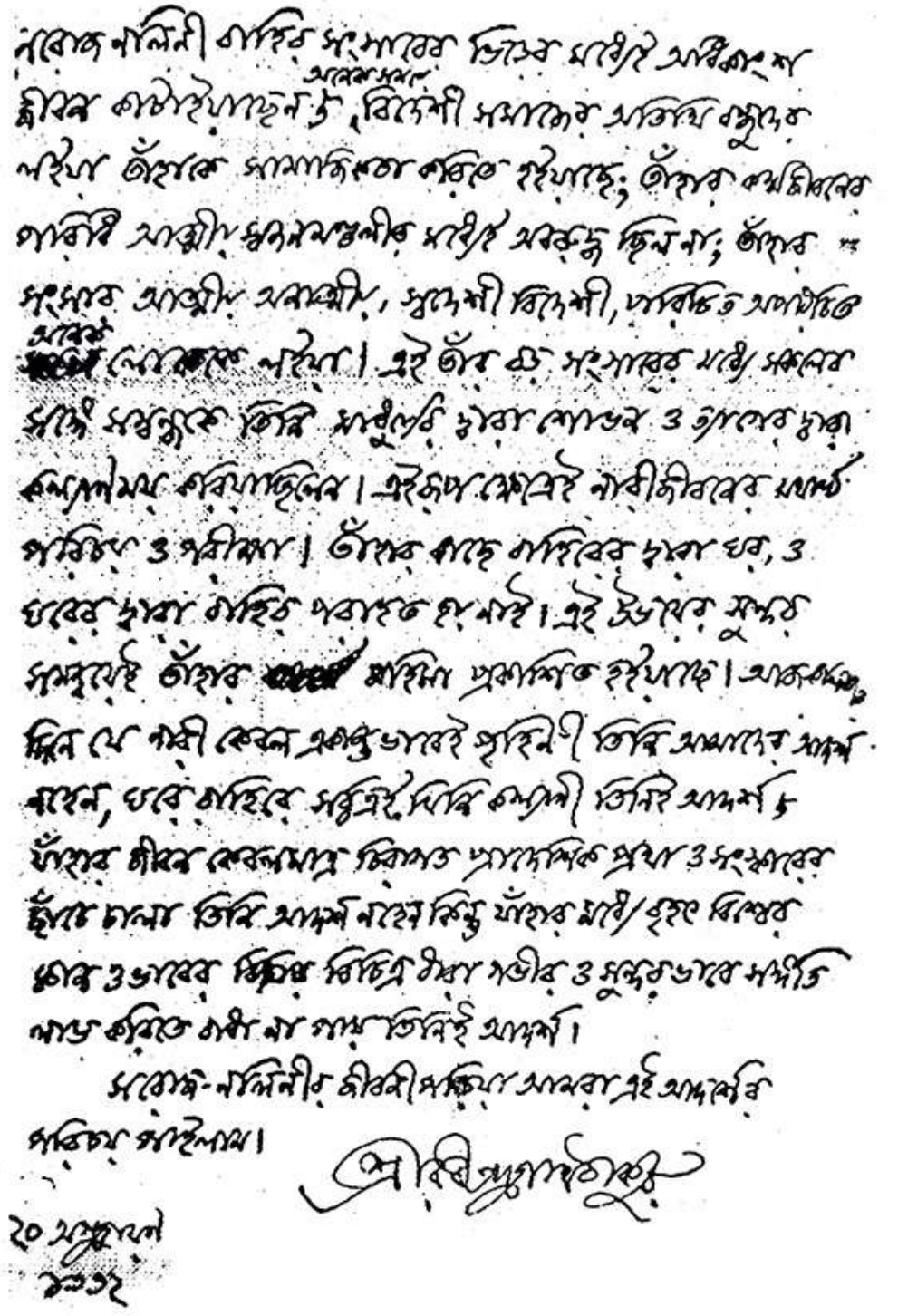

ঘটল তাঁর সুপরিচিত ব্রতচারী আন্দোলন। এই আন্দোলন তিনি লন্ডনে পর্যন্ত প্রসারিত করেছিলেন এবং লন্ডনে গিয়ে স্যার মাইকেল স্যাডলার, স্যার ফ্রান্সিস ইয়ং হাজব্যান্ড, লরেন্স বানিয়ান, লেডি কারামাইকেল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে ব্রতচারীর অনুরাগী করে তুলেছিলেন। এ সময়ে লন্ডনে ছিলেন গাইকোয়াড় (বরোদার ভূতপূর্ব)। তিনি গুরুসদয়কে দেশে ফিরে ব্রতচারীদল সহ সফরের আমন্ত্রণ জানান এবং দেশে ফিরেই গুরুসদয় সদলে সেখানে গিয়ে দিগ্বিজয়ীর সম্মান পান। ফিরে আসার পর তাঁকে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে বিশাল সংবর্ধনা জানানো হয়। এছাড়া হায়দ্রাবাদ, মহীশূর প্রভৃতি প্রদেশ থেকেও তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সেসব রাজ্য সদলে পরিভ্রমণ করেন। দক্ষিণ ভারতেও তা পরিব্যাপ্ত হয়।

এই ব্রতচারীর আদর্শের সন্ধান তিনি পান বীরভূমে থাকার সময়। আমি বীরভূমের ছেলে—ছোটো থেকে রায়বেঁশে দেখেছি, ব্রতচারী দেখেছি, নেচেছি, গান গেয়েছি। গুরুসদয় আমাদের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর দুই প্রধান রায়বেঁশে শিষ্য চারকল গ্রামবাসী রামা-হেমা-র শারীরিক কসরত এবং দীর্ঘ বাঁশের উপর নাচ দেখে বিমুগ্ধ হয়েছি। এর মধ্যে যে আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন তাকে তিনি একটি সাংগঠনিক রূপ দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষাতেই এই আন্দোলনের প্রকৃতি আমরা উদ্ধার করি ঃ

"কোন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য মনে দৃঢ় এবং পবিত্র সংকল্প গ্রহণ করে, একাগ্রচিত্তে সেই সংকল্পকে কার্যে পরিণত করে তুলবার চেষ্টার নামই ব্রত। যে পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকা এ রকম কোন সংকল্প মনে গ্রহণ করে তাকে একাগ্রচিত্তে পালন করাই নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন এবং সেই ভাবে আচরণ করেন তাঁকে আমরা ব্রতচারী বলি। এই হল ব্রতচারী সাধনার অর্থ। কিন্তু আমরা ব্রতচারী কথাটাকে একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেছি। এখানে যে ব্রতের কথা আমরা বুঝি, তা জীবনের যে কোন অভীষ্টসিদ্ধির ব্রত নয়। মানুষের জীবনকে সবদিক থেকে সকল প্রকারে সফল, সার্থক ও পূর্ণতাময় করে তুলবার অভীষ্ট নিয়ে যাঁরা ব্রত ধারণ করেন ব্রতচারী বলতে আমরা এখানে তাঁদের কথাই বুঝব। এর চেয়ে বড় অভীষ্ট সংসারে মানুষের হতে পারে না।

"মানুষের জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থক, সফল ও পূর্ণময় করে তোলবার অভীষ্ট সিদ্ধি করবার জন্য যে ব্রত গ্রহণ করা হবে তাকে আমরা পাঁচ ভাগে অথবা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ব্রতে বিভক্ত করেছি। সেগুলি এই ঃ জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ; সংক্ষেপে জ্ঞা-শ্র-স-ঐ-আ। ব্রতচারী এই পাঁচটি ব্রত অথবা পঞ্চব্রত। এই পাঁচটি ব্রতের সমষ্টিকেই আমরা মানুষের পূর্ণাদর্শের জীবন ব্রত বলে ধরে নিতে পারি। যিনি এই পাঁচটির প্রত্যেকটি পালন করতে দৃঢ় সংকল্প করেছেন ও জীবনে কায়মনোবাক্যে— এই পঞ্চ-ব্রত পালন করবার জন্য সরলভাবে আচরণ করে থাকেন, সেই পুরুষ, নারী, বালক বা বালিকাকেই আমরা বলি ব্রতচারী।

"সুতরাং এই অর্থে দেশের সকল পুরুষ, নারী, বালক, বালিকাই ব্রতচারীর আদর্শ-গ্রহণ

করতে পারেন এবং শুধু তা-ই নয়, প্রত্যেকেরই গ্রহণ করা উচিত। এই আদর্শ পালনের দুটো দিক আছে। একটা ব্যক্তির নিজের দিক দিয়ে নিজের জীবনকে অর্থাৎ নিজের চরিত্রকে, চিন্তাকে, কর্মকে ও দেহকে পূর্ণ করে তোলার দিক থেকে। আর একটা দিক হচ্ছে, সমগ্র মানুষের দিক থেকে অর্থাৎ নিজের চিন্তা, কর্ম ও আচরণের দ্বারা অপর মানুষের এবং সমগ্র মানুষের জীবনকে সফল, সার্থক ও পূর্ণতাময় করে তোলবার যে কর্তব্য তা পালন করার চেষ্টার দিক থেকে, অর্থাৎ ব্রতচারী আদর্শের দুটো দিক থাকবে। একটা হচ্ছে ব্যক্তি মুখ আর একটা সমাজ অথবা সমষ্টি মুখ। এই দু'মুখী আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে যে ফুটিয়ে তুলতে পারবে সেই হবে সত্যকার এবং সফলতাবান ব্রতচারী, এবং এই অর্থে প্রত্যেক ব্রতচারীই নিজেকে সমগ্র বিশ্বে পৌরজন বলে মনে করতে পারেন।

"কিন্তু ব্রতচারীর সমষ্টি মুখ আদর্শ পালনের বেলা এটা ভুললে চলবে না, যে সমগ্র মানব জাতির অথবা মানব সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হলে তার আগে প্রত্যেক মানুষকে তার কর্তব্য পালন করতে হবে সেই স্থান বিশেষের বা দেশ বিশেষের মানুষের প্রতি যে স্থান বিশেষের বা দেশ বিশেষের সে অধিবাসী এবং যে স্থান বিশেষের বা দেশ বিশেষের লোকের সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টার ফলে সে তার জীবনে সুখ শান্তি, শিক্ষা, অর্থ ইত্যাদি লাভ করার সুযোগ পেয়েছে বা পাওয়ার আশা রাখে, সেই আদর্শ বা আচরণকে ডিঙ্গিয়ে সে যদি বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের প্রতি আদর্শ আচরণ করতে যায় তবে সে সত্যকার বিশ্বব্রতচারী হ'তে পারবে না। এটা যেমন বিশ্বের দিক থেকে বলা হয়েছে, এই রকম একটা মহাদেশের দিক থেকেও বলা চলে। ধরা যাক যেন ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষ একটা মহাদেশ। তার মধ্যে অনেকগুলি দেশ আছে যার ভিতর বাংলাদেশ একটা বিশিষ্ট দেশ। যে দেশের অধিবাসী হয়ে প্রত্যেক বাঙালী পুরুষ, মেয়ে, বালক, বালিকার নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করা উচিত এবং যে দেশবাসী সমগ্র লোকের প্রতি তার কর্তব্য পালনের আদর্শ তাকে মেনে চলা উচিত। প্রত্যেক ভারতবাসীর উচিত ব্রতচারীর আদর্শ পালন করা। কিন্তু তাই বলে সে যদি ভারতবাসীর প্রতি তার কর্তব্য ও আচরণ ডিঙ্গিয়ে অন্যান্য দেশের অধিবাসীর প্রতি আদর্শ পালন করতে চায়, তা হলে সে যেমন সত্যকার ব্রতচারী হতে পারবে না, সেই রকম প্রত্যেক বাঙালী যদি বাঙালী হিসাবে নিজের চরিত্র, মন, শরীর ও কর্মপদ্ধতি সংগঠন করে বাংলার সমগ্র অধিবাসীদের প্রতি তার কর্তব্য পালনের ব্রত নিয়ে প্রথমে বাংলার ব্রতচারীর আদর্শ গ্রহণ ও নিজে তাতে সিদ্ধি লাভ না করতে পারে তবে তার ভারত ব্রতচারী বা বিশ্ব ব্রতচারী হবার স্পর্দ্ধা ধৃষ্টতামাত্র।

"সুতরাং বাংলার মানুষকে বাংলা দেশকে যদি সফল ও সার্থক হতে হয়, তবে বাংলার অধিবাসী প্রত্যেক পুরুষ, মেয়ে, বালক, বালিকাকে প্রথমত ও প্রধানত হতে হবে বাংলার ব্রতচারী অর্থাৎ বাংলাদেশের অধিবাসীর জীবনের পূর্ণাদর্শ পালক মানুষ।

"যাঁরা জাতিতে বাঙ্গালী নহেন তাঁরাও যদি বাংলাদেশে স্থায়ী বা অস্থায়ী বাস করেন, বাংলাকে ভালবাসেন ও বাংলার সেবা করার জন্য আগ্রহান্বিত হন, তবে তাঁরাও বাংলার ব্রতচারী হতে পারেন।"

"এসব ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিরা ব্রতচারীর কোন উস্তাদ বা নেতার সামনে আমি বাংলাকে ভালবাসি', 'আমি বাংলার সেবা করব' এবং আমি বাংলার ব্রতচারী হব' এই তিন উক্তি করলেই তাঁদের 'বাংলার ব্রতচারী' সঙ্ঘভুক্ত করা হত। কীভাবে এই উক্তিগুলি বলতে হয় ও পঞ্চব্রত দীক্ষা নিতে হয় তা প্রত্যেক 'উস্তাদ' ও নেতাকে পূর্বাহ্নেই শিখিয়ে দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া ব্রতচারী সঙ্ঘের সদস্য, হওয়ার পদ্ধতি গুরুসদয় তাঁর 'ব্রতচারী সখা' গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশেষভাবে দিয়ে রেখেছিলেন।

"দেশ ও পরিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ব্রতচারীর কাজকর্ম বিভিন্ন হত, যেমন 'জঙ্গল পানার নির্বাসন' বাংলার ব্রতচারীর ক্ষেত্রে অবশ্য কর্তব্য ছিল। কিন্তু যে দেশে জঙ্গল পানা নেই, সেখানে এ কর্তব্য অনাবশ্যক বলে বিবেচিত হত। কর্মপদ্ধতির পার্থক্য ও বিভিন্নতা অনুসারেই ব্রতচারীকে নানা প্রাদেশিক সঙ্ঘে ভাগ করতে হয়েছিল। বলা হয়েছিল, ব্রতচারী পরিচেষ্টা পঞ্চব্রতের মধ্য দিয়ে সর্বত্র বিশ্বের মানবসমাজে ঐক্য ও সখ্য আনয়ন করবে। কিন্তু মূলত এক ও অবিভক্ত থেকেও জীবনের পূর্ণতা লাভের জন্য দেশ ও কালের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন পণ গ্রহণ করে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ব্রতচারী সঙ্ঘ গড়ে উঠবে। স দেশে ব্রতচারীর পঞ্চব্রত একই থাকবে। কিন্তু দেশ ও অবস্থাভেদে এই পঞ্চব্রত মূলক কর্তব্য পালনের পণের পার্থক্য থাকবে।"

আসলে স্বদেশকে ভালোবাসা থেকেই তাঁর এই সাধনা। সমসাময়িক কালে তিনি বহুজনের প্রশংসাধন্য হয়েছিলেন, শুধুমাত্র একটা ব্যক্তিগত কারণের জন্যেই তারাশঙ্কর তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। হয়তো এর মধ্যে কিছু সত্যতাও ছিল। যাঁরা তাঁকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ অগ্রগণ্য। ২৭ ফাল্গুন ১৩৩৭ তারিখে একটি চিঠিতে তিনি গুরুসদয়কে লিখেছিলেন :

'বিদেশ থেকে ফিরে এসে আপনার আর একটি যে অধ্যবসায় দেখলুম তাতে আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়েছে। দেশের স্বাস্থ্য এবং অন্নের সংস্থান খুবই জরুরি সন্দেহ নেই — কিন্তু আনন্দের প্রকাশ তার চেয়ে কম প্রয়োজনীয় নয়। দেশের জনসাধারণ বলতে যাদের বুঝায় সেই পল্লীবাসীরা তাদের নৃত্যগীতে কাব্যকলায় অজস্রভাবে প্রাণের আনন্দ প্রকাশ করেছে। মরা নদীর মাঝে মাঝে জলকুণ্ডের মতো এখনো তার অবশেষ দেখা যায়, কিছুদিনের মধ্যে তা সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হবে এমন আশঙ্কা আছে। আমাদের শিক্ষিত — সম্প্রদায়ের মূঢ়তা তার অন্যতম কারণ। আমরা গ্রন্থকীট, দেশের গভীর প্রাণ-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যোগ নেই। আমরা ইংরেজী ইস্কুলের "ইস্কুল বয়" — সেইজন্য পুথির নজীর অনুসরণ করে বিদেশীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে পাণ্ডিত্য করতে আমাদের উৎসাহ, কিন্তু সেই রসবোধ নেই যাতে ঘরের কাছে সাধারণের মধ্যে যে সব সৌন্দর্য প্রকাশের উপকরণ আছে তার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ করতে পারি। তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৃত্য। সরস্বতীর এই মহদ্দানকে আমাদের ভদ্র সমাজ অবজ্ঞা করে' পেশাদারের ঘরে ঠেলে দিয়েছে — জনসাধারণের মধ্যে আড়ালে আবডালে কিছু কিছু আছে সসঙ্কোচে — আপনি তাকে

অখ্যাতি থেকে মুক্ত করে' সর্বজনের মধ্যে তার আসন করে দেবার চেষ্টা করছেন, এ কাজটা বড় কাজ। সকল রকম আনন্দের প্রকাশ মানুষের প্রাণশক্তিকে জাগরূক করে রাখে; মানুষ কেবল অন্নের অভাবে মরে না — আনন্দের অভাবে তার পৌরুষ শুকিয়ে মারা যায়। আপনি পল্লীর পুরাতন রায়বেঁশে নাচকে নতুন আবিষ্কার করেছেন; এ রকম পুরুষোচিত নাচ দুর্লভ। এই নাচের উৎসাহকে আপনি ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যেও সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন। পাশ্চাত্য মহাদেশে নৃত্যকাল পৌরুষেরই সহচারী। আমাদের দেশেরও চিত্ত-দৌর্বল্য দূর করতে পারবে এই নৃত্য। তাই আমি কামনা করি আপনার চেষ্টা ব্যাপক হোক সার্থক হোক।

২৭ শে ফাল্গুন, ১৩৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী বিফলে যায়নি। ব্রতচারী আন্দোলন বাংলার গন্ডি ছাড়িয়ে দক্ষিণভারত এমনকি লন্ডনসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছিল। গুরুসদয় ব্রতচারী আন্দোলনের জনক এবং প্রবর্তক। তিনি ব্রতচারীদের মধ্যে 'প্রবর্তকজি' নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। ব্রতচারী আন্দোলন জ্ঞান, শ্রম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দের আন্দোলন। দ্রুত এর জনপ্রিয়তা প্রসারিত হয়। এ সম্পর্কে প্রবর্তকজি লিখেন :

> ব্রতচারী পরিচেষ্টা দ্রুতবেগে বাংলার শহরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ছে; বহু সংঘ গড়ে উঠছে, শত শত লোক ব্রতচারীর ব্রত গ্রহণ করে জীবন পথে অগ্রসর হচ্ছেন। অথচ ব্রতচারী পরিচেষ্টা বর্তমান বিধিবদ্ধ আকারে অতি অল্প দিন মাত্রই আরম্ভ হয়েছে। বাংলার নর-নারী ব্রতচারী আদর্শের মধ্যে যে একটি পরিপূর্ণ জীবন-পথের সন্ধান পাচ্ছেন, ব্রতচারী পরিচেষ্টার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে এইজন্য আমি আমার ক্ষুদ্র চেষ্টাকে সার্থক মনে করছি।

'ব্রতচারী সখা' এবং 'ব্রতচারী পরিচয়' নামে যে দুটি বই এখানে সংকলিত হয়েছে সেখান থেকে ব্রতচারী ভুক্তির পদ্ধতি সম্পর্কে পাঠক সবিশেষ অবহিত হতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে ব্রতচারী লোকনৃত্য সমিতি (১৯৩২), ব্রতচারী সোসাইটি (১৯৩২), 'বাংলার শক্তি' মাসিক পত্রিকার প্রকাশ (১৯৩৬-এ প্রথম প্রকাশিত হয়ে একটানা ১৪ বছর প্রকাশিত — এখানে গুরুসদয়ের কর্মের ও জীবনের বিস্তারিত পরিচয় বর্তমান), ব্রতচারী গ্রামে স্থাপন (১৯৪০) তার সংগঠক গুরুসদয় ব্রতচারী আন্দোলনকে একটি সংগঠিত রূপ দিতে চেয়েছিলেন এবং পেরেছিলেন।

গুরুসদয় একজন প্রতিষ্ঠিত ফোকলোরিস্টও। গ্রামগঞ্জ থেকে নানা গ্রাম্য গীতি উদ্ধার ও প্রচারের কাছে তিনি প্রভূত শ্রম ও নিষ্ঠার বিনিয়োগ করেছিলেন। এজন্য ময়মনসিংহ ফোক ড্যান্স অ্যান্ড ফোক মিউজিক সোসাইটি (১৯২৯) পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি (১৯৩১)

প্রভৃতি স্থাপন করেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ইংরেজ ফোকলোরিস্ট সিসিল শার্প (Cecil James Sharp — ১৮৫৯-১৯২৪)-এর কাছ থেকে। তাঁর বহু লেখায় গুরুসদয় শার্পের কাছে তাঁর ঋণস্বীকার করে গেছেন — 'Every word of what Cecil Sharp said twenty-five years ago about England and English people applies today with an equal if not greater force to us in Bengal and to our own folk art and our own folk songs and folk dances' (Folk Arts and Crafts of Bengal' – in cellected Papers by Gurusaday Datta)

তাঁর এই বিশিষ্ট লোকভাবনাকে তিনি সাহিত্য, শিল্প, সংস্কার, নৃত্য, ক্রীড়া, বিজ্ঞান এবং ভাষায় বিন্যস্ত করে দেখতে চেয়েছিলেন। লোকসঙ্গীতের অনুসন্ধিৎসা শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত' -এর মতো সংকলনের জন্ম দিয়েছিল (পাণ্ডুলিপিতে গানের সংখ্যা ৪২৩) জন্ম দিয়েছিল 'পটুয়া সংগীত'-এর মতো গ্রন্থের (১৯৩৯)। লোকশিল্পের সর্বস্তরে তাঁর আগ্রহ ছিল। সংগ্রহ এবং রচনাপ্রকাশ — উভয়বিধ ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর আগ্রহের কথা সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছিলেন। পটচিত্র, কাঁথা, কাঠের কাজ, মুখোশ, টেরাকোটা, আলপনা, পিঁড়িচিত্র বিষয়ে তাঁর কিছু রচনার পরিচয় এই সংকলনে বিধৃত রইল। তাঁর সংগ্রহশালার (গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে, জোকা, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা) রয়েছে এগুলির বিশিষ্ট সংগ্রহ। দীনেশচন্দ্র সেন ছাড়া তাঁর সময়ে লোকশিল্প বিষয়ে ইংরেজিতে লেখালেখি আর কেউ করেছেন বলে জানি না — আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ বা মুহম্মদ মনসুরউদ্দিনের কথা মনে রেখেই বলছি একথা। লোকস্থাপত্য বিষয়ে তাঁর মথুরাপুরের দেউল প্রবন্ধটি পাঠক পড়তে পারেন। আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এখানে সহজেই অনুধাবন করা যায়। মনে রাখতে হবে 'গণ' শব্দটির সুষ্ঠুপ্রয়োগ তিনিই করেছিলেন গণশিল্প, গণসঙ্গীত প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে।

লোকনৃত্য বিষয়ে তাঁর অধিকার ও বিশ্লেষণের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রায়বেঁশে নাচ ছাড়া ঢালি, কাঠি, জারি, শারি, ঝুমুর, বাউল, কীর্তন, ব্রত, মাদল পূজা, ব্রতচারী নৃত্য নিয়ে তিনি বহু প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করে গেছেন। এঁদের মধ্যে 'রায়বেঁশে' নাচের গুরুত্ব তিনি সবিশেষ আরোপ করেছিলেন। এমনকি বেশ কিছু লোক পরিভাষাও তিনি সৃষ্টি করে গেছেন —

Culture — সংকৃষ্টি
Art — রসকলা, রসশ্রী, শিল্পী
Honour — অভিমর্যাদা
Festival of duty — কৃত্যালি
Festival of dance — নৃত্যালি
Demonstration — অভিপ্রদর্শন
Outing trip — ভ্রমন্তিকা
Activity — আলি প্রভৃতি।

Tradition — ক্রমধারা, ক্রমচর্যা
Movement — পরিচেষ্টা
Duty — কৃত্য
Romantic — রমন্তিক
Design — পরিরচনা
Message — অভিবাণী
Training — উপশীলন

তাঁর এই যাবতীয় কর্মপ্রচেষ্টার পিছনে যেটি সবচয়ে ক্রীড়াশীল ছিল তা হ'ল তাঁর অশেষ স্বদেশপ্রেম। বাংলাদেশ ও বাঙালি তাঁর স্বপ্ন। তার উন্নতি তাঁর লক্ষ্য এবং তাতেই জীবনদান তাঁর পূর্ণায়ন। স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য ও নারীমুক্তিতে দেশের যে সার্বিক কল্যাণ তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। কালিদাস নাগের ভাষায় — তিনি অনিত্যতার মধ্যে একটি অমৃত সমাজ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

আমরা গুরুসদয়দত্তের নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ প্রকাশ করে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। পূর্ণাঙ্গ রচনাবলি প্রকাশের ইচ্ছা রইল — বাকি রচনাবলি নিয়ে অন্য একটি খণ্ড প্রকাশ করে। তা সম্ভব হবে পাঠকের আনুকূল্য পেলেই। তাঁর ইংরেজি রচনাসমূহের সংকলনও মুদ্রিত হচ্ছে। মূল রচনার সঙ্গে মুদ্রিত ছবিগুলি কপিরাইট আইন ও অন্য অসুবিধার জন্য ছাপা গেল না বলে দুঃখিত। বর্তমান বাঙালি সমাজ যদি তাঁর অভীষ্ট পূরণে পুনশ্চ সচেষ্ট হয়, তবে তা হবে আমাদের যৌথ শ্রদ্ধাঞ্জলি। প্রকৃতপক্ষে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সংকলন।

পরিশিষ্টে সংকলিত বইগুলির বিষয়ে একটি পরিচায়িকা সংযুক্ত হল। দু-একটি মূলগ্রন্থের বানান অপরিবর্তিত রইল।

কলকাতা পুস্তক মেলা
২০০৮

সূচিপত্র

ভজার বাঁশী ১৯—৪২

ভজার বাঁশী ২১; বুড়ী ও ভেড়ী ২২; শেয়ালের শিকার ২৪; দুষ্টুমি আর কর্‌ব না ২৬; আঙ্গুল-চোষা ছেলে ২৮; কৃষ্ণচন্দ্রের শিকার ২৯; মিনি ও খুদী ৩০; গাধার গেল প্রাণ ৩১; এক পেরেকের জন্যে ৩১; নাম ছিল "কিচ্ছু না" ৩২; এক ছিল এক বুড়ী ৩২; সকাল সকাল শুতে যায় ৩২; ছিলেন তিনটি পণ্ডিত ৩২; টুনু পাখী ৩২; জুতোর মধ্যে বাসা ৩৩; ছেলেমেয়ে কি দিয়ে হয় তৈরি? ৩৩; নরহরি ৩৩;যদু-লীলা ৩৪; খোকার খেলার ক'টা দিন ৩৪; মাটি থেকে পিন্‌টি ৩৪; ভোরে কাক ৩৪; ধনী মানী হবে যারা ৩৫; কেন মিছে ভেবে মর ৩৫; হেঁয়ালি ৩৫; হেঁয়ালি ৩৫; ব্যস্ত অলি ৩৬; ঝিকিমিকি ছোট্ট তারা ৩৬; গান ৩৭; বসন্তের মহোৎসব (গান) ৩৮; স্বরলিপি (ব্যস্ত অলি) ৪০; ঝিকিমিকি ছোট্ট তারা ৪০; মোরা ঘুরে ফিরি ৪১; বসন্তের মহোৎসব ৪১; কোরস্ ৪২।

ব্রতচারী সখা ৪৩—১২২

ব্রতচারী বিজ্ঞান ৪৫; ব্রতচারী প্রণীতি ৫৩; ব্রতচারী ভুক্তির পদ্ধতি ৫৪; ব্রতচারীর ষোলো আলি ৫৬; ব্রতচারীর পর্যায় বিভাগ ৬০; বিভিন্ন পর্যায়ের ব্রতচারীদের অনুষ্ঠিতব্য আলিগুলি সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে নির্দেশ ৬১; শিশু-ব ৬১; ছো-ছো-ব ৬১; ছো-ব-৬১; কি-শো-ব ৬১; যু-ব ৬২; প্রৌঢ়-ব ৬২; প্র-ব ৬২; গানের সাজি ৬২; জ-সো-বা ৬৩; বাংলাভূমির দান ৬৪; আমরা বাঙালি ৬৪; বাংলাভূমির মাটি ৬৪; লেখাপড়া ৬৫; লেখাপড়া ৬৬; বাংলা-প্রেম ৬৬; নারীর মুক্তি ৬৭; সূর্যিমামা ৬৭; কোদাল চালাই ৬৮; আমরা মানুষ দল ৬৮; হ্যাঁ ও না ৬৯; কচুরিপানা ৬৯; চল হই ৭০; ব্রতচারীর নাম ৭০; চাস্ যদি ৭০; বীর নৃত্য ৭১; তরুণ দল ৭১; রাইবিশে ৭১; জীবনোল্লাস ৭৩; বাংলার স্থান ৭৩; প্রার্থনা ৭৩; স্বাগত ৭৪; সবার প্রিয় ৭৫; মিলন স্মৃতি ৭৫; আগুয়ান বাংলা ৭৬; চল্ চল্ ৭৬; অগ্রে চল্ ৭৭; ব্রতচারী ৭৭; তরুণতা ৭৭; বাংলার মানুষ ৭৮; বাংলার সন্ততি দল ৭৯; নারীর স্থান ৭৯; হয়ে দেখ ৮১; পূর্ণ-স্ব-স্থ ও পূর্ণ স্বরাট ৮১; মানুষ হ ৮১; চাষা ৮২; সাধনা ৮২; সোনার বাংলা ৮৩; খাটি খাটাই ৮৫; কাট কাট ৮৬; কর্মযোগ ৮৬; বাংলার শক্তি ৮৬; বৃক্ষ রোপণ ৮৭; বৃক্ষকর্তন ৮৭; নাইরে ব্যবধান ৮৭; বাংলাভূমির দান ৮৮; করব মোরা চাষ ৮৮; সাঁতার সংগীত ৯০; আমরা সবাই অভিন ৯১; বাংলার জয় ৯১; শা-স্ব-বা ৯২; ভারত গাথা ৯৩; বাংলাদেশ ৯৫; বী-র-বা ৯৮; গঙ্গারাঢ়ী ৯৮; ভারতমাতা ৯১; জয় ভারত ৯৯; মাতৃভূমি ১০০; হা-খে-না-খা ১০০; হা-না-বা ১০১; হর-আর জবু ১০২; ব্রতচারী গ্রাম ১০৩; শিক্ষা বলি কাকে? ১০৪; লোকগীতি ১০৬; সারি নৃত্যের গান ১০৬; বাউল নৃত্যের গান ১০৭; ঝুমুর নৃত্যের গান ১০৮; জারি নৃত্যের গান ১০৮; বয়াত ১০৯; গান ১০৯; বয়াত ১১০; গান ১১০; বয়াত ১১০; বন্দনা ১১১; কাঠি নৃত্যের গান ১১১; কাঠি নাচের গান ১১১; রায়বেঁশে নৃত্য ১১১; রায়বেঁশে নৃত্যের ঢোলবোল ১১২; ঢালি নৃত্য ও ঢোলের বোল ১১৩; ব্রত নৃত্যের ঢাক বাজনার বোল ও নৃত্যের বিষয় ১১৪; ধানভানা ১১৫; মেঘারানী ১১৬; সংযোজিত লোকগীতি ও লোকনৃত্যের ভূমিকা ১১৬; পাইক নৃত্য গীত, গান ১১৬; গাজন নৃত্য ও গীত ১১৭; গানের সমর ঢাকের বোল ১১৭; গাজনের গান ১১৭; বধূবরণ নৃত্যের গান ১১৮; রাসনৃত্যের গান ১১৯; গরবা নৃত্যের গান ১২০; ঝুমুর, ঝুমুর নৃত্যের গান ১২১; মালয়ালি লোকনৃত্যের গান ১২২।

কবিতা ১২৩—১৩৭

চাঁদের বুড়ি ১২৫; গানভঙ্গ ১২৫; ধার্মির বক ১২৬; উত্তর দাও ১২৭; ঘর ১২৭; বাহির ১২৭; ও রাজহাঁস ১৩০; ভাববার কথা ১৩০; মেসোর সাথে ১৩১; বলতে পারো ১৩১; এক বুড়া ব্রাহ্মণ ১৩২; শিখে রাখো ১৩২; হতেম যদি ১৩৩; সাম্য ও মৈত্রী ১৩৪; হতে যদি রাজা ১৩৪; দুরন্ত ১৩৬; জন্তু হলে ১৩৬।

বিবিধ কবিতা ১৩৮—১৫৮

তুমি ও আমি ১৩৮; জীবন সঙ্গিনী ১৩৯; নারীর মুক্তি ১৪০; কর্মযোগ ১৪০; বাংলার গান ১৪১; বাংলার মাটি ১৪২; সখ্যের গান ১৪২; পুরী বিবরণ ১৪৩; তীর্থ ১৪৪; মিউজিয়াম ১৪৫; বিধমাশ্রম ও আশ্রম বিদ্যালয় ১৪৫; তন্ময় ১৪৬; প্রেরণা ১৪৭; মিলন-মঙ্গল ১৪৭; নারীর স্থান ১৪৮; বাঙালি ১৪৯; মোহ-মুদ্‌গর ১৫১; বাংলার মাটি ১৫৪; গ্রামের কাজের কখগ ১৫৫; অমরতা ১৫৬; নারীর মুক্তি ১৫৮।

প্রবন্ধ—১ ১৫৯—১৭০

গোড়ায় গলদ ১৬১; কে অগ্রসর হইবে ১৬৪; সমস্যা ও সমাধান ১৬৭।

ব্রতচারী-পরিচয় ১৭১—২৪৪

ব্রতচারী-শক্তি ১৭৫; ব্রতচারীর ছন্দ-সাধনা ১৭৯; শক্তি-সাধনা ১৮২; বাংলার স্ব-ভাব, স্ব-ছন্দ ও স্ব-ধারা ১৮৫; শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙালি (ক) ১৯০; শাশ্বত বাংলা-ভূমি ও শাশ্বত বাঙালি (খ) ১৯৭; বাংলার জাতিগঠনে ব্রতচারীর স্থান ২০২; ধর্ম সমন্বয়ে ব্রতচারী ২০৭; আত্মগঠন ও জাতিগঠনে ব্রতচারী-পদ্ধতির আবশ্যকতা ২১২; বাংলার মানুষের স্ব-ধারা-সংযোগ ও স্ব-মূল-প্রতিষ্ঠা ২২১; বাংলা ভূমির বীর-সংস্কারের সঙ্গে বাঙালির মূল সংযোগ ২২৫; ভারতের আত্মার পুনরুজ্জীবনে ব্রতচারীর দান ২৩০; গণস্বরাজ ও গণসাম্যের আদর্শ ২৩৪; ব্রতচারী আভাষণ ২৩৯; সখ্য-সাম্য সং-স্থাপন ২৪২।

প্রবন্ধ—২ ২৪৫—৪০০

ব্রতচারী, —পূর্ণ-ব্রত হও! ২৪৭; মুষ্টি সাহায্যের প্রবর্তন ২৫০; ব্রতচারী কৃত্য ২৫৩; ব্রতচারী অনুচেষ্টায় অর্থ ও লক্ষ্য ২৫৬; প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠান ও অনুপ্রেরণা ২৫৯; ব্রতচারী আহ্বান ২৬২; রায়বেঁশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ২৬৪; বাংলার জাতীয় সংগীত ও জাতীয় নৃত্য ২৬৮; রায়বেঁশে ২৭০; কাঠিনৃত্য ২৭১; ঢালি ২৭২; জারি ২৭৩; বাউল ২৭৩; কীর্তন নৃত্য ২৭৩; অবতার নৃত্য ২৭৪; ধূপনৃত্য ২৭৪; স্বদেশ কাহাকে বলে? ২৭৫; অবতারণা ২৭৮; নিবেদন ২৭৯; কোথায় চলিয়াছি? ২৮১; বাঙ্গালোর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ২৮৪; প্রাচীন বাংলার নারী-জীবনে আনন্দের স্থান ২৮৮; বাংলার পল্লীসম্পদ ২৯৩; শিক্ষার আদর্শ ২৯৬; বাংলার দুর্দশা ৩০৫; বিলাতের কথা ৩০৭; স্মৃতিকথা-৩১৫; বাংলার রসকলা প্রতিভা ৩২১; রাজঘাটের ব্রতনৃত্য ৩৩০; বাংলার লোকনৃত্য ও লোকসংগীত ৩৩৪; বাংলার রসকলা-সম্পদ ৩৪০; রসশ্রীর পরিচয় ৩৫০; বাংলার পোড়ামাটি-শিল্প ৩৫৩;ভারতের সংস্কৃতিতে গণ-শিল্পের স্থান ৩৫৫; বাংলার সামরিক ক্রীড়া ৩৫৭; বাংলার জীবনে নৃত্য ও ক্রীড়ার স্থান ৩৬২; পরিচায়িকা ৩৬৭; চিত্রকলায় বাংলার স্থান ৩৬৯; পটুয়া ৩৭০; বাংলার মেয়েদের আলপনা ও প্রাচীন-চিত্র ৩৭৩; বাংলার পুতুল ৩৮৪; মথুরপুর দেউল ৩৮৭; পুরীর শ্রীক্ষেত্র-তীর্থে ৩৯১; প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন ৩৯৬।

পাগলামির পুঁথি ৪০১—৪১৪

রচনা-পরিচিতি ৪১৫—৪২৪

ভজার বাঁশী

ভোলানাথের সেজ ছেলে ভজহরি ভট্ট—
বাঁশী সাধ্‌তে শিখেছিল ছিল যখন ছোট্ট।
কিন্তু — একটিমাত্র সুর ছাড়া আর বাজাতে সে জান্‌ত না—
"তাইরে নারে — তাইরে নারে — তাইরে নারে — নান্‌তা না।"

ভজহরির বাঁশী দিয়ে এমন্ আওয়াজ ফুট্‌ত,
(যে) পাড়ার যত ছেলেমেয়ে ছুটে এসে জুট্‌ত;
(কেন না) এমন ধারা বাঁশী তা'রা বাজাতে কেউ জান্‌ত না—
"তাইরে নারে— তাইরে নারে— তাইরে নারে — নান্‌তা না।"

বাঁশী ফুঁক্‌তে ভজা এম্‌নি চমৎকারটি পার্‌ত
যে তা'র আওয়াজ শুনে চুপ্‌টি ক'রে থাক্‌তে কেহই নার্‌ত।
যেম্‌নি বাঁশী শুন্‌ত, অমনি নেচে সবাই উঠ্‌ত—
(এমন কি) গাধাগুলো দু'পায় নেচে তা'র পিছনে ছুট্‌ত।

একদিন একটা গয়লানী তা'র গাই দুইতেছিল
ভজা তখন বাঁশী নিয়ে তানটি জুড়ে দিল;
গয়লানী আর গাই— দুয়েতে উঠ্‌লো নেচে শেষে,
দুধের হাঁড়ি গেল পড়ে'— দুধ গেল সব ভেসে।

একদিন একটা বুড়ী, নিয়ে হাঁসের ডিমের ঝুড়ি
যাচ্ছে হাটে, অমনি ভজা বাজনা দিল জুড়ি;
বুড়ী উঠ্‌ল নেচে, ডিম সব ভেঙ্গে হ'ল চুর
বুড়ী উঠ্‌ল রেগে— ভজা আনন্দে ভরপুর।

একদিন একটা লোক অনেক হাঁড়ি বাসন নিয়ে
যাচ্ছে একটা গাধার পিঠে বোঝাই করে' দিয়ে—
(অম্‌নি) বাঁশী হাতে নিয়ে ভজা ছেড়ে দিল তান,—
বোঝা গেল কমে', গাধা আহ্লাদে আটখানা!

বুড়ী ও ভেড়ী

ছিল এক বুড়ী
গিয়ে সে হাটে
কিন্‌ল এক ভেড়ী।

নিয়ে সেই ভেড়ী
আস্‌তে ফিরে বাড়ী,
রাস্তায় একটা খাল
দিতে হ'ল পাড়ি।

বুড়ী বলে— "ভেড়ী,
ডিঙ্গিয়ে দাও পাড়ি";
কিন্তু ভেড়ী খাল ডিঙ্গোবে না!

তখন বুড়ী হয়ে নাচার
বলে, "দূর হোগ্‌গে ছার;
এ যে ভারী বিষম ব্যাপার!"

তা'রপর খানিক গিয়ে হাঁটি
সে দেখ্‌লে একটা লাঠি—
বল্লে, "লাঠি— লাঠি,
ভেড়ীরে দাও পিটি—
ভেড়ী খাল ডিঙ্গাবে না,
আর, আমার আজ বাড়ী যাওয়াও হবে না"

কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল!
লাঠি ভেড়ী পিট্‌বে না।
তখন বুড়ী হয়ে নাচার
বলে, "দূর হোগগে ছার;
এ যে ভারী বিষম ব্যাপার!"

তখন— চলে আরো খানিক টুকুন্‌
সে দেখ্‌লে একটা আগুন—

বল্লে, তা'র কাছে এগিয়ে—
"তুমি লাঠি দাও পুড়িয়ে—
লাঠি ভেড়ী পিট্‌বে না
ভেড়ী খাল ডিঙ্গাবে না
আর, আমার আজ বাড়ী যাওয়াও হবে না।"

কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল!
আগুন লাঠি পোড়াবে না
তখন বুড়ী হয়ে নাচার
বলে— "দূর হোগ্‌রে ছার;
এ যে ভারী বিষম ব্যাপার!"

তখন এগিয়ে কয়েক নল*
বুড়ী পেলে খানিক জল;
বল্লে— "জল, তোমার প্রতাপ দেখাও,
ঐ আগুনটাকে নিবাও,
আগুন লাঠি পোড়াবে না,
লাঠি ভেড়ী পিট্‌বে না,
ভেড়ী খাল ডিঙ্গোবে না,
আর, আমার আজ বাড়ী যাওয়া হবে না।"

কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল!
জল আগুন নিবাবে না,
তখন বুড়ী হ'য়ে নাচার
বলে— "দূর হোগ্‌গে ছার!
এ যে ভারী বিষম ব্যাপার!"

তখন— গিয়ে আরো খানিক দূর
বুড়ী দেখ্‌লে একটি বাছুর,
বল্লে তা'রে মাথার দিব্যি দিয়ে—
"তুমি জলটারে দাও খেয়ে—
জল আগুন নেবাবে না
আগুন লাঠি পোড়াবে না,

* বাঁশের দৈর্ঘ্য দ্বারা পরিমিত স্থান।

লাঠি ভেড়ী পিট্‌বে না,
ভেড়ী খাল ডিঙ্গোবে না,
আর, আমার আজ বাড়ী যাওয়াও হবে না।"

কিন্তু হায়রে পোড়া কপাল।
বাছুরে জল খাবে না।
তখন বুড়ী হ'য়ে নাচার
বলে, "দূর হোগ্‌গে ছার।
এ যে ভারী বিষম ব্যাপার।"

চলে হতাশ হ'য়ে তাই
বুড়ী দেখ্‌লে একটা কসাই;
বল্লে— "ও ভাই কসাই,
কর বাছুরটারে জবাই;
বাছুরে জল খাবে না,
জল আগুন নিবাবে না,
আগুন লাঠি পোড়াবে না,
লাঠি ভেড়ী পিট্‌বে না,
ভেড়ী খাল ডিঙ্গাবে না,
আর, আমার আজ বাড়ী যাওয়াও হবে না।"

তখন, একটা ছোরা হাতে নিয়ে
যেন কসাই এল ধেয়ে
অমনি, বাছুর— লাগ্‌ল জল খেতে,
জল— লাগ্‌ল আগুন নিবাতে,
আগুন—লাগ্‌ল লাঠি পোড়াতে,
লাঠি— লাগ্‌ল ভেড়ী পিট্‌তে,
খাল ডিঙ্গালে ভেড়ীতে—
আর, শেষটা— বুড়ীও গেল বাড়ীতে।

শেয়ালের শিকার

ক্ষুধায় কাতর একটি শেয়াল শিকার করতে চলে,
আঁধার রাতে পথ না দেখে পড়ল মহা গোলে;

"একটু আলো দাওগো আমায়"— চাঁদকে ডেকে বলে—
"(কেননা) অনেক দূরের রাস্তা আমায় যেতে হবে চলে' গো—
যেতে হবে চলে!
অনেক দূরের রাস্তা আমায় যেতে হবে চলে'।"

কিন্তু কি ভাগ্যি তা'র। অবশেষে ভুলোর উঠানে পশে'
দেখে ভুলোর কালো হাঁসটা সাম্‌নে আছে বসে'
(বলে তা'রে) "ভালবাসায় প্রাণটা আমার যাচ্ছে যে গো খসে',—
(আর) চাই যে আমি হাড়গুলো তোর চিবিয়ে খেতে কসে গো!
চিবিয়ে খেতে কসে'।
চাই যে আমি হাড় গুলো তোর চিবিয়ে খেতে কসে'।"

(তা'র পর) হাঁসের গলা কাম্‌ড়ে ধরে' হঠাৎ করে' 'ক্যাক্'
উঠিয়ে নিল পিঠের উপর হ্যাঁচ্‌কা টানে এক্!
হাঁস বেচারি উঠ্‌ল ডেকে-প্যাঁক্-প্যাঁক্-প্যাঁক্—
"চুপ্ করে থাক্!" শেয়াল তারে বল্‌লো করে 'খ্যাক' গো
বল্‌লো ক'রে 'খ্যাঁক্'!
"চুপ্ করে থাক্।" শেয়াল তারে বল্‌লো করে 'খ্যাঁক্'।

ধড়মড়িয়ে ভুলোর মাতা বিছানা ছেড়ে উঠে'
মুখ বাড়িয়ে দেখ্‌লে গিয়ে জানালা দিয়ে ছুটে;
ডাকে— "ভুলো— ভুলো—ভুলো— কালো হাঁসটা যে রে ম'লো!
আর দুষ্টু শেয়াল পিঠে তুলে নিয়ে তা'রে গেল গো!
নিয়ে তা'রে গেল!

কুকুর ডাকে ভুলো ছেড়ে "তু-উ" "তু-উ" বোল্—
কুকুরগুলো দিল জুড়ে "ভেউ" "ভেউ" কল্লোল;—
শেয়াল বলে— "আহা কিবা উঠছে গানের বোল!
কিন্তু গান শুন্‌তে গেলেই আমার বাজবে এখন গোল গো!
বাজবে এখন গোল!
গান শুন্‌তে গেলেই আমার বাজবে এখন গোল।"
অবশেষে শেয়াল আপন গর্তে এল চলে',
"ক্যা-হুয়া"— "ক্যা-হুয়া" ডেকে বাচ্চাদের বলে।;—
দেখ্‌রে কেমন মোটা কালো হাঁস পড়েছে কলে,